بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৮ আগস্ট, ২০২৫ মোতাবেক ০৮ যহুর, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

জলসার পূর্বে মক্কা বিজয়ের ঘটনাসমূহের আলোচনা হচ্ছিল। কিছু কট্টর ইসলাম বিরোধী এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম। তাদের মধ্যে আরো কয়েকজন রয়েছে।

ওয়াহ্শী বিন হারব তাদের একজন। উহুদের যুদ্ধে হযরত হামযাকে সে-ই শহীদ করেছিল এবং মক্কা বিজয়ের পর তায়েফে পালিয়ে যায়। যখন তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করে তখন সে-ও এসে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। বুখারীর বর্ণনায় ওয়াহ্শীর ইসলাম গ্রহণের উল্লেখ এভাবে রয়েছে, যা সে নিজে বর্ণনা করেছে। সে বলে, আমি মক্কায় অবস্থান করছিলাম, এমনকি সেখানে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। তারপর আমি তায়েফ চলে যাই। লোকেরা আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর কাছে দূত পাঠায় এবং আমাকে বলা হয়, তিনি (সা.) দূতদের সাথে বিরোধ করেন না। সে বলে, আমিও তাদের সাথে বের হই এবং আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর কাছে পৌঁছে যাই। তিনি (সা.) আমাকে দেখে বলেন, তুমি কি ওয়াহ্শী? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, তুমি হামযাকে হত্যা করেছিলে? আমি বললাম, ব্যাপারটি তা-ই যেমনটি আপনি শুনেছেন। তিনি (সা.) বলেন, তোমার পক্ষে কি সম্ভব যে, তুমি তোমার চেহারা আমার থেকে লুকিয়ে রাখবে? তিনি বলেন, একথা শোনার পর আমি সেখান থেকে বের হয়ে চলে যাই। অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর কথার অর্থ এটি ছিল যে, আমাকে তোমার চেহারা দেখাবে না, যেন আমার পুনরায় (হামযার হত্যার কথা) মনে পড়ে না যায়। এরপর যখন আল্লাহ্র রসূল (সা.) মৃত্যুবরণ করেন এবং মুসাইলামা কাযযাব বিদ্রোহ করে; তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, আমি অবশ্যই মুসাইলামার উদ্দেশ্যে বের হব যেন আমি তাকে হত্যা করতে পারি আর এর মাধ্যমে হযরত হামযার (হত্যার) প্রতিদান দিতে পারি। তিনি বলেন, আমিও লোকদের সাথে বের হই। অতঃপর তার (মুসাইলামার) অবস্থা যা হবার তা-ই হয়, অর্থাৎ সে নিহত হয়। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, একটি লোক দেয়ালের একটি ফাটলে দাঁড়িয়ে আছে। এমন মনে হচ্ছিল যেন গোধুম রঙের একটি উট, মাথার চুল এলোমেলো। [এটি মুসাইলামা কাযযাব ছিল যাকে সেখানে দাঁড়ানো অবস্থায় তিনি দেখেছিলেন।] তিনি বলেন, আমি তার দিকে আমার বর্শা নিক্ষেপ করি এবং তার বুকের মাঝখানে নিক্ষেপ করি যা তার দুই কাঁধের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যায়। তিনি বলেন, আনসারের একজন লোক তার দিকে ছুটে যায় এবং তার মাথার খুলিতে তরবারির আঘাত করে। এভাবে সে নিহত হয়।

অনুরূপভাবে আমর বিন হাশিমের দাসী সারাহ ছিল একজন। সে একজন গায়িকা ছিল, যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়েছিল এবং তাঁর কাছে কিছু চেয়েছিল ও দরিদ্রতার অভিযোগ করেছিল। তিনি (সা.) বলেন, তোমার গানবাজনার কী হয়েছে? তুমি তো খুব গান গাইতে, টাকা কামাতে। সে বলে, মুশরিক নেতারা বদরের যুদ্ধে মারা যাবার পর থেকে তারা গান শোনা বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি (সা.) তাকে এক উট

বোঝাই করা খাদ্যশস্য দান করেন। তারপর সে কুরাইশের কাছে চলে যায়। ইবনে খাতাল তাকে মহানবী (সা.) সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা শেখাত এবং সে সেসব ব্যঙ্গাত্মক কবিতা গাইত। [অর্থাৎ, এই পুরস্কার নেবার পরেও সে তার কর্মকাণ্ড থেকে বিরত হয় নি।] আর এ-ই ছিল সেই মহিলা যার কাছে হযরত হাতিবের চিঠি পাওয়া গিয়েছিল। যাহোক, সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং সে হযরত উমরের খিলাফত পর্যন্ত জীবিত ছিল।

অনুরূপভাবে ইবনে খাতালের দাসী ফারতানা ছিল আরেকজন। সে-ও তাঁর (সা.) সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা গাইত। সে-ও ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল।

তারপর হযরত হারেস বিন হিশামের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে লেখা হয়েছে। তিনি মক্কার একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন এবং আবু জাহলের পিতার দিক থেকে ভাই ছিলেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের বোন তার স্ত্রী ছিল। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি এবং আবদুল্লাহ্ বিন আবী রবীয়া হযরত উম্মে হানীর ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, কারণ হযরত আলী তাদের পেছন পেছন তাদেরকে হত্যা করার জন্য আসছিলেন। হযরত উম্মে হানী তাদের দুইজনকে নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আমি তাদের আশ্রয় দিয়েছি। এতে তিনি (সা.) হযরত উম্মে হানীকে বলেন, যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ তাকে আমরাও আশ্রয় দিলাম। হারেস বিন হিশাম বর্ণনা করেন, আমরা দুইদিন সেই ঘরে অবস্থান করি। এরপর আমরা আমাদের ঘরে চলে যাই। আমরা আঙিনায় বসে ছিলাম, কেউ আমাদের সাথে বিরোধ করত না; আমাদের (কেবল) হযরত উমরের ভয় হতো। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি চাদর পরে আমার দরজায় বসে ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ হযরত উমর চলে আসেন, তার সাথে কিছু মুসলমান ছিল। তারা সালাম করে চলে যায়। তিনি বলেন, আমার লজ্জা লাগত যে, মহানবী (সা.) আমাকে দেখবেন; কারণ তিনি (সা.) আমাকে সর্বত্র মুশরিকদের সাথে দেখেছিলেন। তারপর আমার তাঁর (সা.) দয়া, করুণা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার কথা মনে পড়ে। আমি তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাৎ করি। সে সময় তিনি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করছিলেন। তিনি আমার সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করেন। আমি তাঁকে (সা.) সালাম করি এবং কলেমা শাহাদাত পাঠ করি। তিনি বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার, যিনি তোমাকে হিদায়াত দিয়েছেন। তোমার মতো মানুষ কীভাবে ইসলাম থেকে দূরে দূরে ছিল! হারেস বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি দেখে নিয়েছি যে, ইসলাম থেকে দূরে থাকা যায় না।

অনুরূপভাবে রয়েছে সুহায়েল বিন আমরের ইসলাম গ্রহণ। তিনিও মক্কার একজন নেতা ছিলেন এবং তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি হুদাইবিয়ার সন্ধি করার জন্য কুরাইশের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন। সুহায়েল বিন আমর বর্ণনা করেন, যখন মহানবী (সা.) মক্কায় প্রবেশ করেন এবং বিজয়ী হন তখন আমি আমার ঘরে চলে যাই। আমি দরজা বন্ধ করে দেই। আমি আমার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ্‌কে তাঁর (সা.) সমীপে প্রেরণ করি যেন সে মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে আমার জন্য নিরাপত্তা চাইতে পারে। আমার ভয় ছিল, পাছে আমাকে হত্যা করে ফেলা হয়! হযরত আবদুল্লাহ্ তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থিত হন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতা আপনার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছেন। মক্কাবাসীদের তো সাধারণ ক্ষমা ও নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিলই; আসলে এরা ছিল সেসব নেতৃস্থানীয় কাফির এবং এত কট্টর বিরোধী, যারা আশ্বস্ত হতে পারছিল না আর ভাবতেই পারছিল না যে, তারা নিরাপদ থাকবে। আর তাদের অজ্ঞতাপূর্ণ চিন্তা অনুযায়ী তাদের একটা

আশঙ্কা লেগেই থাকত যে, তাদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে; যে কারণে সে তার ছেলেকে দ্বিতীয়বার তাঁর (সা.) কাছে পাঠিয়েছিল। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, সে আল্লাহ্ তা'লার নিরাপত্তার সাথে নিরাপদ আছে। সে সামনে আসুক, অর্থাৎ স্বাধীনভাবে বাইরে ঘোরাফেরা করুক। মহানবী (সা.) তাঁর চারপাশে বসা সাহাবীদের বলেন, তোমাদের মধ্যে যার সুহায়েলের সাথে দেখা হবে সে যেন তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না দেখে। সুহায়েলের মতো বুদ্ধিমান ও সম্মানিত ব্যক্তি বেশি দিন ইসলাম থেকে দূরে থাকতে পারবে না। সে দেখে নিয়েছে যে, যে অবস্থায় সে ছিল সেটা তার জন্য লাভজনক নয়, অর্থাৎ কুফরের অবস্থা।

হযরত আব্দুল্লাহ্ নিজের পিতার কাছে যান এবং তাকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মন্তব্য সম্পর্কে বলার পর সুহায়েল বলে, খোদার কসম! তিনি শৈশবেও অনুগ্রহকারী ছিলেন এবং এ বয়সেও অনুগ্রহ প্রদর্শন করছেন; অর্থাৎ মহানবী (সা.)। হযরত সুহায়েল নিরাপদে যাতায়াত করতে থাকেন। তিনি হুনায়নের যুদ্ধে মুশরিক থাকা অবস্থাতেই মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। [হুনায়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি।] হুনায়নের যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে জি'রানা নামক স্থানে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, যা মক্কা থেকে ২৭ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত বলে কথিত আছে; এটি তায়েফ যাবার পথে একটি কূপ। ইসলাম গ্রহণের পর তার মাঝে অভাবনীয় আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধিত হয়। লেখা আছে, মক্কা বিজয়ের সময় যে-সব কুরাইশ সর্দার ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের মাঝে সুহায়েলের চেয়ে বেশি নামায, রোযায় অভ্যস্ত এবং সদকা প্রদানকারী আর কেউ ছিল না। তিনি (নামাযে) অধিক ক্রন্দন ও আহাজারি করতেন, কুরআন পড়ার সময় প্রায়ই কাঁদতেন। হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি বিদায় হজ্জের সময় দেখেছি, সুহায়েল বিন আমর (পশু) জবাই করার স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন আর মহানবী (সা.)-এর কুরবানীর পশুগুলোকে তাঁর (সা.) কাছে এগিয়ে দিচ্ছেন। মহানবী (সা.) নিজের হাতে সেগুলো জবাই করেন। অতঃপর মাথা মুণ্ডন করার ব্যক্তিকে ডাকেন এবং নিজের চুল মুণ্ডন করেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি দেখি, সুহায়েল মহানবী (সা.)-এর কর্তিত চুলগুলো নিজের চোখে স্পর্শ করাচ্ছে। [মহানবী (সা.) চুল মুণ্ডন করালে পরে সেগুলো যখন সুহায়লের হাতে আসে, তখন তিনি সেগুলো নিজের চোখে স্পর্শ করান।] তিনি (রা.) বলেন, সেসময় আমার মনে পড়ে গেল, এই সুহায়েলই হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় মহানবী (সা.)-কে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখতে বাধা দিয়েছিল, যা চুক্তির ওপর লেখার কথা ছিল। আর 'মুহাম্মদ' শব্দের সাথে 'রসূল' লেখারও বিরোধী ছিল এবং 'রসূলুল্লাহ্' শব্দটি মুছে না দেওয়া পর্যন্ত সে চুক্তি লেখা আরম্ভ করে নি। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করি– যিনি সুহায়েলকে ইসলামের পানে হিদায়াত দিয়েছেন। আর এমনভাবে হিদায়াত দিয়েছেন যে, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় পরম উন্নতি করেছেন।

সুহায়েল বিন আমরের আরেকটি কীর্তির কথা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। বলা হয়, সুহায়েল কুরাইশের মাঝে একজন প্রখ্যাত বক্তা ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে কাফির হিসেবে মুসলমানদের হাতে বন্দি হন। তিনি নিজের ঠোঁটে একটি দাগ তৈরি করে রেখেছিলেন। হযরত উমর (রা.) এহেন অবস্থায় মহানবী (সা.)-এর নিকট আবেদন জানান, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তার সামনের দাঁত দুটি উপড়ে দিন, যেখানে সে দাগ দিয়েছে। তাহলে সে আর কখনো আপনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করার জন্য দাঁড়াতে পারবে না। [তার দাঁত উপড়ে ফেলুন, মুখে দাঁত না থাকলে ভালোভাবে কথা বলতে পারবে না।] তিনি (সা.) বলেন, হে উমর!

তাকে ছেড়ে দাও। সে সময় খুবই সন্নিকটে যখন সে এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হবে আর তুমি তার প্রশংসা করবে। হযরত উমর (রা.) তো তাকে শাস্তি প্রদান করাতে চাচ্ছিলেন; কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, না, কিছু বোলো না। এমন এক সময় আসবে যখন সে একস্থানে দাঁড়াবে এবং এমন বক্তব্য প্রদান করবে যে, তোমরা তার প্রশংসা করবে। যাহোক, মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের সময় সেই মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়। মক্কাবাসীরা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। কুরাইশ যখন মক্কাবাসীদের মুরতাদ হতে দেখে এবং হযরত আত্তাব বিন আসীদ উমুভী যখন লুকিয়ে পড়েন– যিনি মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে মক্কার আমীর নিযুক্ত ছিলেন, অর্থাৎ ভীষণ খারাপ অবস্থা হয়ে গিয়েছিল; ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত সুহায়েল বিন আমর বক্তব্য প্রদানের উদ্দেশ্যে দাঁড়ান এবং বলেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা সবার শেষে ইসলাম গ্রহণ করেছ। সবার শেষে ইসলাম গ্রহণ করে সর্বপ্রথম পরিত্যাগকারী হয়ো না। খোদার কসম! এ ধর্ম এমনভাবে বিস্তৃতি লাভ করবে যেভাবে চন্দ্র ও সূর্য উদয় হতে অস্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এভাবে তিনি অর্থাৎ হযরত সুহায়েল (রা.) একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন আর এই বক্তৃতা মক্কাবাসীদের হৃদয়ে প্রভাব ফেলে এবং তারা বিরত হয়। হযরত আত্তাব বিন আসীদ (রা.)– যিনি লুকিয়ে পড়েছিলেন, তাকেও ডেকে আনা হয় এবং কুরাইশ সদস্যরা ইসলামের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

এরপর হযরত উতবা এবং মুআত্তেব (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রসঙ্গে লেখা আছে, হযরত আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.) যখন মক্কায় আসেন তখন তিনি (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার ভাতিজা আবু লাহাবের ছেলে উতবা এবং মুআত্তেব কোথায়? আমি বলি, আমি তাদের দেখি নি। মহানবী (সা.) তখন বলেন, আমি তাদের দেখছি না, তারা কোথায়? হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, তারা অন্যান্য মুশরিকের মতো পাশ কেটে আছে। মহানবী (সা.) বলেন, তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসো। হযরত আব্বাস বাহনে চড়ে উরানা যান, যা আরাফাতের নিকটবর্তী একটি উপত্যকা, এবং তাদেরকে নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উভয়ই বয়আত করেন। অতঃপর তিনি (সা.) দাঁড়ান, তাদের হাত ধরেন এবং মুলতাযাম-এ নিয়ে আসেন, অতঃপর কিছু সময় দোয়া করেন এবং ফেরত চলে আসেন। মুলতাযাম হলো হাজরে আসওয়াদ ও কাবার দরজার মধ্যবর্তী বায়তুল্লাহ্‌র প্রাচীরের অংশ, যে স্থান জড়িয়ে ধরে দোয়া করা সুন্নত আর এটি দোয়া কবুলের একটি বিশেষ স্থান। তাঁর (সা.) পবিত্র মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হচ্ছিল। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে খুশি রাখুন। আমি আপনার চেহারায় আনন্দের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। তিনি (সা.) বলেন, আমি আমার প্রতিপালক-প্রভুর নিকট আমার চাচার দুই ছেলেকে চেয়েছিলাম আর তিনি আমাকে তাদের দান করেছেন।

এরপর সাফওয়ান বিন উমাইয়্যার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা রয়েছে। সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা ছিল মক্কার নেতা উমাইয়্যা বিন খালাফের ছেলে। অজ্ঞতার যুগে সে কুরাইশের অভিজাতদের একজন ছিল এবং কুরাইশের বাগ্মী লোকদের একজন ছিল আর ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল। সে মক্কায় মুসলমানদের দুঃখকষ্ট প্রদানকারী ও নিপীড়নকারীদের একজন ছিল। বদরের যুদ্ধের পর সে মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং উমায়ের বিন ওয়াহাবকে এই কাজের জন্য প্রস্তুত করেছিল। যদিও তার নাম তাদের মধ্যে ছিল না যাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে নিজেই এই ভয় ও আশঙ্কায় মক্কা থেকে পালিয়ে

গিয়েছিল যে, তাকে বোধহয় হত্যা করা হবে। সে লোহিত সাগরের দিকে, জেদ্দার পথে পালিয়ে যায়। উমায়ের বিন ওয়াহাব যিনি তার বন্ধু ছিলেন এবং তিনি ইসলাম কবুল করে নিয়েছিলেন; তিনি সেই উমায়ের, যাকে সাফওয়ান একথা বলে মহানবী (সা.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে মদীনায় পাঠিয়েছিল যে, তুমি যদি তাঁকে হত্যা করো তাহলে তোমার সন্তানসন্ততির দেখাশোনা এবং ভরণপোষণের দায়িত্ব আমার। কিন্তু উমায়ের যখন মদীনায় পৌঁছে তখন মহানবী (সা.) তার পুরো পরিকল্পনার কথা জেনে যান এবং উমায়ের এই মু'জিযা দেখে তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। এখন মক্কা বিজয়ের সময় উমায়ের তার বন্ধু সাফওয়ানের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন আর চিন্তিতও ছিলেন। হযরত উমায়ের বিন ওয়াহাব (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সাফওয়ান আমার জাতির নেতা। সে আপনার ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে। আপনি তাকে নিরাপত্তা প্রদান করুন। মহানবী (সা.) বলেন, তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হলো। তিনি অনুরোধ করলেন, আপনি আমাকে এমন একটি চিহ্ন প্রদান করুন যা আমি তাকে নিরাপত্তার প্রমাণ হিসেবে দেখাতে পারি। মহানবী (সা.) নিজের পরিহিত পাগড়ি খুলে তাকে দেন। হযরত উমায়ের সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং সাফওয়ানের কাছে এমন সময়ে গিয়ে পৌঁছান যখন সে নৌকায় আরোহণ করতে যাচ্ছিল। হযরত উমায়ের (রা.) তাকে বলেন, আমি এমন এক সত্তার নিকট থেকে এসেছি যিনি সব মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি পবিত্র, মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। আমি তোমার জন্য মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা নিয়ে এসেছি। সাফওয়ান বলল, আমি তোমার সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরত যাব না যতক্ষণ না তুমি আমাকে এমন কোনো চিহ্ন দেখাবে যা আমি চিনি। এতে তিনি (রা.) তাঁর (সা.) দেওয়া পাগড়ি দেখান। সাফওয়ান হযরত উমায়েরের (রা.) সাথে ফেরত আসে। সে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় তখন তিনি (সা.) মসজিদে সাহাবীদেরকে আসরের নামায পড়াচ্ছিলেন। যখন তিনি সালাম ফেরালেন তখন সাফওয়ান উচ্চৈঃস্বরে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! উমায়ের আমার কাছে আপনার চাদর নিয়ে এসেছে যে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। তিনি (সা.) বললেন, একেবারে সঠিক। সে বলে, আমাকে দুই মাসের সময় দিন, আমি এখনই ইসলাম গ্রহণ করতে চাই না। তিনি (সা.) বলেন, চার মাস সময় দেওয়া হলো। আশা করছি, তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে। সাফওয়ান মুশরিক অবস্থাতেই মক্কায় বসবাস করতে থাকে। যখন মহানবী (সা.) হাওয়াযিন অভিমুখে যান এবং তায়েফ ও হুনায়েনের যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টন করেন, তখন তিনি (সা.) সাফওয়ানকে দেখেন– সে সেই গিরিপথটি দেখছিল যেটি ভেড়া ও ছাগল দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সে অপলক দৃষ্টিতে সেটি দেখছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-ও সাফওয়ানকে দেখছিলেন যে, সে সেই উপত্যকাটি দেখছে যেটি সম্পদে পূর্ণ। তিনি (সা.) বলেন, এই উপত্যকা কি তোমাকে বিস্ময়ে ফেলে দিয়েছে যে, এই উপত্যকায় কত সম্পদ রয়েছে! সাফওয়ান বলে, জি হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, এই উপত্যকা এবং এতে যা কিছু রয়েছে সব তোমার; এগুলো নিয়ে যাও। সাফওয়ান এ সমস্ত সম্পদ গ্রহণ করে এবং বলে, যে উত্তম পদ্ধতিতে নবীর আত্মা দান করতে পারে সেভাবে অন্য কেউ পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। সেই স্থানেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সাফওয়ান মক্কায় ৪২ হিজরী সনে হযরত মুয়াবিয়ার

খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ বলেন, হযরত উসমানের (রা.) বিশৃঙ্খলা ও শাহাদাতের সময়ে শাহাদাত বরণ করেন।

মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণকারী মক্কার এসব নেতাদের অধিকাংশই পরবর্তীতে নিজেদের জীবনে অসাধারণ আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, হযরত উমর (রা.) নিজ খিলাফতকালে একবার মক্কা আগমন করেন। শহরের বড়ো বড়ো নেতৃবৃন্দ যারা বিখ্যাত বংশের ছিলেন– তারা তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন। তাদের ধারণা হলো, হযরত উমর (রা.) আমাদের বংশ সম্পর্কে খুব ভালো করে জানেন। এখন যেহেতু তিনি স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান, তাই তিনি আমাদের বংশের সম্মান রক্ষা করবেন আর আমরা আমাদের হারানো সম্মান ফেরত পাবো। তারা আসেন এবং হযরত উমর (রা.)-র সাথে কথা বলতে থাকেন। তারা কথা বলছিলেন, এমন সময়ে হযরত উমরের (রা.) বৈঠকে হযরত বেলাল (রা.) আসেন। কিছুক্ষণ পরে হযরত খাব্বাব (রা.) আসেন, আর এভাবে প্রাথমিক যুগে ঈমান আনয়নকারী ক্রীতদাসেরা একের পর এক আসতে থাকেন। অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে যারা ঈমান এনেছিলেন, সেসব ক্রীতদাস একের পর এক আসতে থাকেন। তারা সেসব ব্যক্তি ছিলেন যারা এসব নেতৃবৃন্দের অথবা তাদের পিতৃপুরুষদের ক্রীতদাস ছিলেন। নেতৃবৃন্দ বসে ছিলেন। যারা এসেছিলেন তারা তাদের পিতৃপুরুষদের ক্রীতদাস ছিলেন– যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি। যখন তারা ক্রীতদাস ছিলেন তখন নিজেদের ক্ষমতার যুগে এরা তাদের প্রতি ভয়ঙ্করতম অত্যাচার করত। হযরত উমর (রা.) প্রত্যেক ক্রীতদাসের আগমনে তাদের স্বাগত জানান। অর্থাৎ যারা অতীতে ক্রীতদাস ছিল আর বর্তমানে সম্মানিত, তাদের সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানান। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লেখেন, হযরত উমর (রা.) প্রত্যেক ক্রীতদাসের আগমনে এভাবে অভ্যর্থনা জানান যেন তারা নেতা। আর নেতাদেরকে বলেন, আপনারা কিছুটা পেছনে সরে যান। নেতারা সভায় সামনের দিকে বসতো। যখন এই পুরোনো ঈমান আনয়নকারীরা আসছিলেন তখন তিনি (রা.) মক্কার সেসব নেতাকে বলছিলেন, কিছুটা পেছনে সরে যাও আর তাদেরকে সামনে বসতে দাও। এমনকি সেসব তরুণ নেতা যারা হযরত উমরের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, পেছনে যেতে যেতে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সেই যুগে তো কোনো বড়ো বড়ো হলরুম হতো না, সম্ভবত সেটি কোনো ছোটো কক্ষ ছিল। আর যেহেতু সবার এতে সংকুলান হতো না, তাই পেছনে যেতে যেতে সেসব নেতার জুতোর ওপর গিয়ে বসতে হলো। যখন মক্কার সেসব নেতা জুতোর স্থানে পৌঁছে যায় আর তারা নিজ চোখে দেখছিল, কীভাবে একজনের পর একজন মুসলমান দাস আসছিল আর তাদেরকে সামনের দিকে বসানোর জন্য সেসব মানুষকে অথবা নেতাদেরকে পেছনে সরার আদেশ দেওয়া হচ্ছিল– তারা এতে মনে কষ্ট পান।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, সে সময় আল্লাহ্ তা'লা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন যে, একের পর এক এমন মুসলমান এসে পড়েন যারা কোনো এক কালে কাফিরদের দাস ছিলেন। যদি একবার এসব নেতাকে পেছনে সরতে হতো, তাহলে হয়ত তারা (কষ্ট) অনুভবও করতেন না। কিন্তু যেহেতু বার বার তাদেরকে পেছনে সরতে হয়েছে, এজন্য তারা সহ্য করতে পারেন নি এবং উঠে বাহিরে চলে যান। বাহিরে বের হয়ে তারা পরস্পরকে এই বলে অভিযোগ করতে থাকেন, দেখলে! আজ কীভাবে আমাদের অপমান ও লাঞ্ছিত করা হলো? এক একজন দাস এলো আর আমাদেরকে পেছনে সরানো হলো, এমনকি আমরা

জুতোর মাঝে গিয়ে পৌঁছেছি। এ কথার প্রেক্ষিতে তাদের মাঝ থেকে একজন তরুণ বলে ওঠে, এই কাজের জন্য দোষী কে? উমরের দোষ নাকি আমাদের পূর্বপুরুষদের দোষ? তোমরা যদি একটু চিন্তা করো তাহলে বুঝতে পারবে, এই কাজে হযরত উমরের কোনো দোষ নেই; এর দায় আমাদের পূর্বপুরুষদের, যার শাস্তি আজকে আমরা পেলাম। কেননা আল্লাহ্ যখন নিজ রসূলকে প্রেরণ করেছেন তখন আমাদের পূর্বপুরুষরা বিরোধিতা করেছে। কিন্তু এই ক্রীতদাসেরা তাঁকে গ্রহণ করেছে। আর তারা সকল প্রকার কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করেছে। অতএব যদি আজ আমাদের এই সভায় লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়, তার দায় উমরের নয় বরং এর দায় আমাদের। তার এই কথা শুনে অন্যরা বলে, আমরা মানছি, এটি আমাদের বাপদাদাদের অপরাধের ফল। কিন্তু অপমানের এই কলঙ্ক দূর করার কোনো উপায় আছে নাকি নেই? এ বিষয়ে তারা পরস্পর পরামর্শ করে দেখল যে, আমাদের বুদ্ধিতে কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছি না; তাই চলো, আমরা হযরত উমরের (রা.) কাছে জিজ্ঞেস করি, এর উপায় কী? তারা হযরত উমরের (রা.) কাছে আসেন আর বলেন, আমাদের সাথে যা হয়েছে সে সম্পর্কে আপনি ভালোভাবেই জানেন, আর আমরাও জানি। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি ক্ষমাপ্রার্থী, আমি অপারগ ছিলাম। কেননা তারা সেসব লোক যারা মহানবী (সা.)-এর সভায় সম্মানিত ছিলেন। হতে পারে, তারা তোমাদের দাস ছিল; কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সভায় তারা সম্মানিত ছিল। এ কারণে তাদের সম্মান করা আমার দায়িত্ব ছিল। তারা বলে, আমরা জানি এটি আমাদের অপরাধের পরিণতি। কিন্তু এই কলঙ্ক মোচনের কি কোনো উপায় নেই? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা এই যুগে যারা এখানে বসে আছি তারা সেই যুগের কথা চিন্তাও করতে পারি না। মক্কার নেতারা মক্কায় কী ধরনের প্রতাপ ও প্রভাব রাখত– তা আমরা এই যুগে অনুমানও করতে পারব না। কিন্তু হযরত উমর (রা.) তাদের বংশগত মর্যাদা সম্পর্কে জানতেন। তিনি (রা.) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর মক্কাতেই বড়ো হয়েছিলেন। এ কারণে হযরত উমর জানতেন, এসব তরুণের পূর্বপুরুষরা কী ধরনের সম্মানের অধিকারী ছিল। হযরত উমর (রা.) জানতেন, তাদের সামনে কেউ চোখ তুলে কথা বলারও সাহস করত না। তিনি (রা.) জানতেন, তাদের কী ধরনের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। যখন তারা একথা বলল তখন হযরত উমরের চোখে এসব ঘটনা ভেসে ওঠে আর তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তখন তিনি আবেগে কথাও বলতে পারছিলেন না। তিনি (রা.) হাত উঠিয়ে উত্তর দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করেন। যার অর্থ হলো, উত্তরে অর্থাৎ সিরিয়ায় ইসলামী যুদ্ধ হচ্ছে। যদি তোমরা সেসব যুদ্ধে অংশ নাও, তাহলে হয়ত সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে। অতঃপর তারা সেখান থেকে উঠে যায় আর ত্বরিত সেই যুদ্ধে যোগদানের জন্য যাত্রা করে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সেই সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানদের মাঝ থেকে একজনও আর জীবিত ফিরে আসেন নি। সবাই সেখানেই শাহাদাত বরণ করেন। আর এভাবেই তারা নিজেদের বংশের নাম থেকে লাঞ্ছনার দাগ দূর করেন।

বলা হয়ে থাকে, ইয়ারমুকের যুদ্ধে এই নেতৃবর্গ প্রশংসনীয় বীরত্ব ও আত্মত্যাগ প্রদর্শন করেছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, যুদ্ধ যখন সমাপ্ত হয় তখন মুসলমানরা বিশেষ করে ইকরামা ও তার সাথিদের সন্ধান করে। তখন তারা কী দেখল! দেখল, সেই ব্যক্তিদের মাঝে বারোজন সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছেন। তাদের মাঝে একজন ছিলেন ইকরামা। একজন মুসলমান সৈনিক তাদের কাছে আসেন আর ইকরামাকে খুবই সংকটাপন্ন অবস্থায় দেখেন। তিনি বলেন, হে ইকরামা! আমার কাছে পানির মশক

আছে, তুমি সামান্য পানি পান করো। ইকরামা মুখ ফিরিয়ে দেখেন, পাশেই হযরত আব্বাসের পুত্র হযরত ফযল (রা.) আহতাবস্থায় পড়ে আছেন। ইকরামা সেই মুসলমানকে বলেন, আমার আত্মাভিমান এটি সহ্য করতে পারবে না যে, যারা মহানবী (সা.)-কে তখন সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন যখন আমি তাঁর চরম বিরোধী ছিলাম, তারা ও তাদের সন্তানরা পিপাসার্ত থেকে মারা যাবে আর আমি পানি পান করে জীবিত থাকব! [তাদের মাঝে একে অপরের জন্য আত্মত্যাগের এক নতুন উদ্দীপনা ও স্পৃহা সৃষ্টি হয়েছিল।] তাই প্রথমে তাকে অর্থাৎ হযরত ফযল বিন আব্বাস (রা.)-কে পানি পান করাও, আর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে আমার কাছে নিয়ে আসবে। সেই মুসলমান হযরত ফযল (রা.)-এর কাছে যান। তিনি পরবর্তী আহত ব্যক্তির দিকে ইশারা করে বলেন, প্রথমে তাকে পানি পান করাও; আমার চেয়ে তার বেশি প্রয়োজন। তিনি সেই আহত ব্যক্তির কাছে গেলে তিনি পরবর্তী আহত ব্যক্তির প্রতি ইশারা করে বলেন, আমার চেয়ে তার বেশি প্রয়োজন, প্রথমে তাকে পানি পান করাও। এভাবে তিনি যে সৈন্যের কাছেই যেতেন তিনি তাকে অন্যের কাছে পাঠিয়ে দিতেন আর কেউ পানি পান করতেন না। তিনি যখন সর্বশেষ আহত ব্যক্তির কাছে পৌঁছান ততক্ষণে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি পুনরায় পূর্বের ব্যক্তির কাছে আসেন, এভাবে (পর্যায়ক্রমে) ইকরামা পর্যন্ত এসে পৌঁছান, কিন্তু তারা সবাই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানানোর এবং কতিপয় বড়ো বড়ো প্রতিমা ধূলিসাৎ করার জন্য মহানবী (সা.) সৈন্যদল গঠন করে প্রেরণ করেন। এর উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়, মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) বিভিন্ন এলাকা অভিমুখে সৈন্যদল প্রেরণ করেন। মূলত এগুলো যুদ্ধবিগ্রহের জন্য ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের বার্তা পৌঁছানো আর কতিপয় স্থানে স্থাপিত প্রতিমাসমূহ ধ্বংস করা, যেগুলো তওহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের ওপর ঈমান আনয়নের পথে এক প্রতিবন্ধক ছিল, যেগুলোর বানোয়াট ও কাল্পনিক ভীতি মানুষের অন্তরে বিরাজমান ছিল। আর এগুলো সম্পর্কে এরূপ ধারণা এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে ছিল। আরববাসীদের অধিকাংশের হৃদয়ে তিনটি প্রতিমা বা দেবীর পরম মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। সেগুলোর নাম হলো, 'লাত', 'মানাত' এবং 'উযযা'। লাত দেবী তায়েফে ছিল; সমগ্র আরবে সেটির সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। মানুষ সেটির নাম নিয়ে শপথ করত আর এর বেদিতে পশু কুরবানী করত। আমর বিন লুহাই, যাকে আরবে প্রতিমাপূজার জনক মনে করা হয়, সে মানুষের অন্তরে এই ধারণা গেঁথে দিয়েছিল যে, নাউযুবিল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌ তা'লা শীতকাল তায়েফে লাতের সাথে আর গরমকাল উযযার সাথে অতিবাহিত করেন।

মানাত আরবের সবচেয়ে পুরোনো প্রতিমা ছিল। এটি সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকা 'কুদায়েদ'-এ মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। আরবের অধিবাসীরা একে সম্মান করত আর এর বেদিতে কুরবানী করত। বিশেষ করে অওস ও খাযরাজ এটির এরূপ সম্মান করত যে, তারা মানাতের নামে ইহরাম বাঁধত। এর শ্রদ্ধা ও সম্মানকে দৃষ্টিপটে রেখে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ'ও করত না, হজ্জ করার সময় নিজের মাথা মুণ্ডন করত না, বরং ফিরে এসে মানাতের কাছে যেত আর সেখানে মাথা মুণ্ডন করত, অবস্থান করত। আর এটি না করলে তাদের হজ্জ অসম্পূর্ণ মনে করত। উযযা– এটি নাখলার নিকটে স্থাপিত কুরাইশের সবচেয়ে বড়ো দেবী ছিল। তারা এর জন্য পশু কুরবানীর একটি স্থানও বানিয়েছিল যেখানে তারা কুরবানী করত। এর নামানুসারে তাদের (সন্তানদের) নাম রাখত এবং এর নামে কসম

খেতো। আমর বিন লুহাইকে আরব ভূখণ্ডে প্রতিমাপূজার প্রবর্তক বলে মনে করা হয়। সে মানুষের হৃদয়ে প্রতিমা সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছিল, এর ফলে জনগণ এই প্রতিমাগুলোকে সাংঘাতিক ভয়ও পেত আবার অত্যন্ত ভক্তিও প্রদর্শন করত। যেভাবে আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি, তাদের ধারণামতে– আল্লাহ্ তা'লা (নাউযুবিল্লাহ্) বিভিন্ন ঋতুতে এই প্রতিমাগুলোর কাছে দিনাতিপাত করতেন। মোটকথা, এ জাতীয় (বিকৃত) ধ্যানধারণা মানুষের হৃদয়ে উযযা দেবীর মাহাত্ম্য এমনভাবে সৃষ্টি করে দিয়েছিল, যেভাবে কাবার সম্মুখে বিভিন্ন উপহার ও উপঢৌকন সামগ্রী নিয়ে আসা হতো, অনুরূপভাবে উযযা দেবীর সম্মুখেও নিয়ে আসা হতো। এটি সেই প্রতিমা– উহুদের যুদ্ধের সময় আবু সুফিয়ান বিজয়ের আনন্দে যার নাম উচ্চারণ করে বলেছিল, اِنَّ لَنَا العزّٰى ولَا عزّٰى لكم [ইন্না লানাল উযযা, ওয়া লা উযযা লাকুম] অর্থাৎ আমাদের আছে উযযা, আর তোমাদের কোনো উযযা নেই। এমনিতে সাধারণত আরববাসী এই তিনটি দেবীকেই সম্মান করত, যদিও কুরাইশের জন্য উযযা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল। লাত দেবী বনু সাকীফের জন্য (নির্ধারিত ছিল) আর মানাত দেবী অওস ও খাযরাজ গোত্রের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

আরববাসীর ধারণামতে, এই তিনটিই নারী ছিল, অর্থাৎ দেবী ছিল। কুরআন করীম এ তিনটি দেবীর উল্লেখ করতে গিয়ে বলে:

أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ إِنْ هِىَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ
وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ

(সূরা নাজম: ২০-২৪)

অর্থাৎ: 'তোমরাও লাত ও উযযার অবস্থা (তথা খবর) শোনাও দেখি! (তারাও কি এরূপ?) আর এগুলো ছাড়া (এদের) তৃতীয় (তথা) মানাতেরও (খবর শোনাও)! কী! তোমাদের ভাগেই সব পুত্রসন্তান আর তাঁর ভাগে রয়েছে কেবল কন্যাসন্তান? এ যে এক ভীষণ অসম বণ্টন! এগুলো তো কেবল নাম, যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা তাদের দিয়ে রেখেছ। (নতুবা এগুলোর মাঝে সত্যতার লেশমাত্র নেই।) এদের সমর্থনে আল্লাহ্ কোনো অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি।' তারা শুধু ধারণা এবং প্রবৃত্তির হীন কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। অথচ তাদের প্রতিপালক-প্রভুর পক্ষ থেকে নিশ্চয় তাদের কাছে সঠিক পথনির্দেশনা এসে গেছে। (তবুও তারা অনুধাবন করে না।)

যাহোক, যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে, মক্কা বিজয়ের পরপরই মহানবী (সা.) প্রতিমাগুলোর সেই আস্তানাগুলো ধূলিসাৎ করার আদেশ প্রদান করেন, যেন মানুষের হৃদয় থেকে তাদের কাল্পনিক ভয় ও ভক্তির ধারণা দূরীভূত হয়, আর এই প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত কল্যাণকর প্রতীয়মান হয়। কেননা এগুলো ধ্বংসের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় থেকে তাদের মিথ্যা ভয় ও প্রতাপ দূরীভূত হতে থাকে এবং তাদের মনে এ বিশ্বাস জন্মাতে আরম্ভ করে যে, সেই এক-অদ্বিতীয় খোদার ধারণাই যথার্থ যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) উপস্থাপন করেন। প্রতিমাগুলো কীভাবে ধূলিসাৎ করা হয়েছিল, কীভাবে এদের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল, কোনো বিরোধিতা হয়েছিল কিনা– এ সম্পর্কে আরো কিছু ঘটনাবলি রয়েছে, সেগুলো পরবর্তীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

নামাযের পরে আমি দুটি গায়েবানা জানাযা পড়াবো যাদের মধ্যে একজন (ভারতের) হায়দ্রবাদের জামশোরো নিবাসী চৌধুরী গোলাম কাদের সাহেবের পুত্র মুকাররম চৌধুরী আব্দুল গফুর সাহেব, যিনি সম্প্রতি বিরানব্বই বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَاجِعُوْنَ। তিনি ছিলেন জমিদার বংশীয়। বাগোড়াকোট থেকে উনিশ শতকের শুরুর দিকে কোট আহমদীয়াতে স্থানান্তরিত হন। তার পিতা জামা'ত এবং খিলাফতের প্রেমে তাকে জাগতিক ও ধর্মীয় উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৪২ সালে কাদিয়ানে প্রেরণ করেন যেখানে চৌধুরী সাহেব পাকিস্তানে হিজরতের আগ পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন এবং সেখানে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাহাবীদের পবিত্র সাহচর্য দ্বারা উপকৃত হন। চৌধুরী গফুর সাহেব এখানে (পাকিস্তানে) আসার পর চিনিওট ও রাবওয়াতে বাকি পড়াশোনা শেষ করেন। পরবর্তীতে করাচি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৯৩ সালে তিনি অবসরে যান। অতঃপর তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। উগান্ডাতে দুই বছর একটি প্রজেক্টে সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি আহমদীয়াতের একজন বীর সুপুত্র ছিলেন। সৃষ্টির সেবাকারী ও অত্যন্ত প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। ভেদাভেদ ছাড়াই সকলের আর্থিক প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকতেন। আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকতেন। নিজ অঞ্চলের কায়েদ ছিলেন। আনসারুল্লাহ্ সংগঠনেও অনন্য সেবা প্রদান করেছেন। দীর্ঘদিন হায়দ্রাবাদের সেক্রেটারি উমুরে আম্মা-র দায়িত্বও পালন করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে নওয়াবশাহ্ ও নওশাহরু ফিরোজ জেলার আমীর হিসেবে নিযুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি খুবই পরিশ্রমের সাথে সে দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনজন ছেলে ও পাঁচজন মেয়ে রয়েছেন।

তার এক মেয়ে হুমায়রা সাহেবা বলেন, সৃষ্টির সেবা করাকে তিনি নিজ ব্যাংক ব্যালেন্স বলে গণ্য করতেন এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বলে বিশ্বাস করতেন। এমন অগণিত আহমদী ও অআহমদী আছেন, তার মাধ্যমে যাদের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ হয়েছে। কোনো ভেদাভেদ ব্যতিরেকে মুসাফির, অসুস্থ ও অসহায় ব্যক্তিদের আর্থিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং বিশাল অংকের অর্থও প্রদান করতেন। জামা'তের স্বার্থে আর্থিক কুরবানীর মানসিকতাও প্রাধান্য পেতো। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন শতবর্ষ জুবিলী উদযাপনের জন্য আর্থিক কুরবানীর আহ্বান জানান তখন তৎক্ষণাৎ 'লাব্বায়েক' বলে পরবর্তী দিনই রাবওয়াতে নির্মিত তার বাড়ি বিক্রি করে বিক্রিত অর্থ পুরোটাই এ খাতে প্রদান করেন। ১৯৬৬ সালে খলীফা নির্বাচিত হবার পর যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) সিন্ধ অঞ্চলে সফর করেন তখন তিনি (রাহে.) হায়দ্রাবাদের কোট আহমদীয়ায় অবস্থিত তার বাড়িতেও যান। ১৯৮১ সালে রাবওয়াতে যখন কাসরে খিলাফত নির্মিত হচ্ছিল, সে সময় সরকারের পক্ষ থেকে তাকে আফ্রিকাতে কোনো প্রজেক্টের কাজে পাঠানো হচ্ছিল আর সেটি তার জন্য অনেক ভালো একটি সুযোগ ছিল। যখন তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-র সকাশে পরামর্শ লাভের জন্য উপস্থিত হন তখন তিনি (রাহে.) বলেন, সেখানে যেয়ো না; সেখানে যাবার চিন্তা বাদ দিয়ে এখানে আমাদের কাসরে খিলাফত নির্মিত হচ্ছে ও এর ছাদ স্থাপনের কাজ হচ্ছে– এর তত্ত্বাবধান করো। সুতরাং তিনি পরবর্তী দিনই কাজ বুঝে নেন এবং সেখানেই অবস্থান করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও তাকে পুরস্কৃত করেছেন। যখন তিনি ছুটি কাটিয়ে ফেরত যান, তখন সরকারের পক্ষ থেকে সে চুক্তি তিনি পুনরায় লাভ করেন আর তিনি বলতেন, এটি কেবলমাত্র খিলাফতের কল্যাণে লাভ হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস ও রাবে (রাহে.)-র সাথেও তার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তারাও তার নিকট যেতেন এবং তার বাসায় অবস্থানও করেছেন। অনুরূপভাবে আমি যখন পাকিস্তানে ছিলাম, তখন আমারও তার বাসায় যাবার সুযোগ হয়েছিল এবং তার বাসায়

অবস্থান করারও সুযোগ হয়েছিল। অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। বরং একবার তো সিন্ধ অঞ্চলে রাতে সফর করতে হয়েছিল আর পরিস্থিতিও স্বাভাবিক ছিল না। তিনি বলেন, আমি আপনাকে নিয়ে যাব। রাতে বৃষ্টিও হচ্ছিল আর ঝড়ো বৃষ্টি ছিল, পথঘাট পানিতে তলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যাহোক, তিনি আমাকে নিয়ে যান। আমাদের যে স্থানে যাবার কথা ছিল সেখানে রাতে গিয়ে আমরা পৌঁছাই। অতঃপর আমি তাকে বললাম, আপনি রাতটা এখানেই থেকে সকালে যান, একা যাবেন না। এ কথা শুনে তিনি বলেন, না। সে সময়ই নিজ গাড়িতে চড়ে রাতেই রওয়ানা হয়ে যান। অত্যন্ত সাহসী ও নির্ভীক ব্যক্তি ছিলেন।

আল্লাহ্‌র পথে কারাবরণকারীদের জন্যও তার উল্লেখযোগ্য সেবা রয়েছে। বিভিন্ন জেলে গিয়ে ব্যবস্থাপনার সাথে যোগাযোগ করে তাদের জন্য সহজসাধ্যতার ব্যবস্থা করতেন। তার মধ্যে মানবসেবার স্পৃহা অসীম ছিল। নিকটাত্মীয়দের খোঁজখবর নিতেন। তার মেয়ে বলেন, তিনি গরিব ও অভাবীদের সাহায্য করতেন। খিলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসা রাখতেন। যুগ-খলীফার প্রতিটি নির্দেশে লাব্বায়েক বলতেন। এমনকি তার দৈনন্দিন বিভিন্ন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুই হতো খিলাফত। তার অআহমদী পরিচিতরাও তার বিভিন্ন ভালো কাজের বিষয়ে কথা বলেন। তার পুণ্যময় প্রভাব তাদের ওপর পড়েছিল। তার বন্ধুত্ব ও পরিচিতর গণ্ডি অনেক বিস্তৃত ছিল। আর সর্বত্র তিনি একজন আহমদী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। সরকারী কর্মকর্তা, সিন্ধুর বড়ো বড়ো রাজনৈতিক বংশের ব্যক্তিবর্গের সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল। আর তাদেরকে প্রায়শই জামা'তের প্রকাশিত কুরআন করীম দেখাতেন আর জামা'ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতেন। এমনকি সম্ভব হলে তাদেরকে রাবওয়াতেও নিয়ে আসতেন। আল্লাহ্ তা'লা মহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তার সন্তানসন্ততিকেও তার পুণ্যময় আদর্শ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হচ্ছে ২৭৫ নং চক, করতারপুর, ফয়সালাবাদ নিবাসী মুকাররম মুহাম্মদ আলী সাহেবের। ইনিও সম্প্রতি সত্তর বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুম মূসী ছিলেন। তারও তিনজন পুত্র ও পাঁচজন কন্যা সন্তান রয়েছে। তার একজন পুত্র জাম্বিয়ার লুসাকা শহরের মুবাল্লেগ সিলসিলাহ। তিনি যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণ করতে বর্তমানে এখানে রয়েছেন বিধায় পিতার জানাযায় অংশ নিতে পারেন নি। মুবাল্লেগ সিলসিলাহ তাহের আহমদ সাইফি সাহেব বলেন, আমার পিতার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা দ্বিতীয় খিলাফতের প্রারম্ভিক দিনগুলোতে হয়েছে, যখন তার দাদা মূসা সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন। মরহুম নিয়মিত রোযা এবং নামাযে অভ্যস্ত, নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী, সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল, নীরব প্রকৃতির, মিশুক, মানবসেবার স্পৃহায় নিবেদিতপ্রাণ, হাসিমুখে সবার সাথে সাক্ষাৎকারী, পুণ্যবান ও নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। খিলাফতের প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসা ছিল। প্রত্যেক কাজের পূর্বে যুগ-খলীফাকে দোয়ার জন্য চিঠি লিখতেন। জামা'তী এবং ধর্মীয় বিভিন্ন প্রোগ্রামে নীরবে অংশগ্রহণ করতেন আর যতদূর সম্ভব সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক কুরবানীতেও অংশ নিতেন। এমটিএ-র যাত্রা যখন শুরু হয় তখন তার ঘরে টিভি ছিল না। তাই এমটিএ-র যাত্রা শুরু হতেই তৎক্ষণাৎ তিনি বাসায় টিভি নিয়ে আসেন যেন যুগ-খলীফার কথা সরাসরি শুনতে পারেন। তিনি (মরহুমের পুত্র) বলেন, যুগ-খলীফার কোনো তাহরীকে আমার বাবা অতি আগ্রহের সাথে অংশ নেন নি– এমন কোনো ঘটনা স্মরণ পড়ে না। অআহমদীদের

সাথেও তার অত্যন্ত ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। যেই কারখানায় তিনি চাকরি করতেন সেখানে অনেক অআহমদীকেও তিনি চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু কিছু অআহমদীর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হলো, তাদের কারো কারো মাঝে তেমন বিবেকবোধ থাকে না; তারপরও তিনি তাদের প্রতি সদাচরণ করেছেন। তারা বিভিন্ন মানুষের কথাবার্তায় প্রভাবিত হয়ে মালিকের কাছে অভিযোগ করে আর দাবি করে যে, তাকে যেন চাকরি থেকে বহিষ্কার দেওয়া হয়। যাহোক, তাকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়, তদুপরি তিনি কোনো হট্টগোল করেন নি। আল্লাহ্ তা'লার দরবারেই তিনি নিজের আবেদন জানান। কিছুদিন পর ফ্যাক্টরির মালিক পুনরায় তাকে ডাকে। আর সেখানে পূর্বের পদেই তাকে পুনর্বহাল করে। কিন্তু যারা তার সাথে এরকম অসদাচরণ করেছিল, তাদের সাথেও তিনি সদাচরণ করেন আর কাজ করে যান। (তার পুত্র) বলেন, তবলীগের চেয়েও বেশি তাদের প্রতি সদাচরণ করার কারণেই ফয়সালাবাদ শহরের আটজন ব্যক্তি আহমদীয়াত গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন। আর তার সন্তানদেরকেও তার এই পুণ্যময় আদর্শ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)